

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৮ অক্টোবর, ২০২২

৪৫ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ১৭ অক্টোবর, ২০২২, সোমবার, ৩০ আশ্বিন, ১৪২৯

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ১০৩ বছরে



নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৭ অক্টোবর ১৯২০ সোভিয়েতের তাসখাণ্ডে গড়ে উঠেছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ৭জন বিপ্লবী মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যা ক্রমেই ব্যক্তি গ্রুপ মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এই উপমহাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে ওঠে। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রাম পাশাপাশি সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজির শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসারিত লাভ করেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু শোষণ

নিপীড়ন নিষ্পেষণ থেকে মানুষের মুক্তি হয়নি। আজ ফ্যাসিস্ট শক্তি তৎপর। দেশের সংবিধান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, গণতন্ত্রকে রক্ষা ও দেশের বহুত্ববাদকে রক্ষা করা আজ শ্রমিক শ্রেণি ও তার পার্টির কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রমিক শ্রেণির এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবেই। পূর্ব বর্ধমান জেলার সর্বত্রই পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার ১০৩ তম বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় (৮৫) প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বড়শুল সিডিপি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতা থেকে অবসরের পর স্বাস্থ্য আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির কাজে জড়িয়ে পড়েন। প্রথমে যুগ্ম সম্পাদক, পরবর্তীতে সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষক ও শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ছিল দৃঢ় সম্পর্ক। এছাড়াও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গেও তাঁর ছিল অটুট বন্ধন। তাঁর স্ত্রী সুজাতা সাম্মান্য চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্বে প্রয়াত হয়েছেন। তিনিও প্রখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা সুলেখা সান্যাল সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচনা সমগ্র পুনর্মুদ্রণে শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সেবা সমিতির উন্নয়ন ও



পরিচালনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন অমল হালদার, তাপস সরকার, ডাঃ তুষারকান্তি বটব্যাল, সেখ সাহিদুল হক, সম্বরণ প্রামাণিক, কমল হাজারী প্রমুখ।

সি.আই.টি.ইউ ১১তম জেলা সম্মেলন সম্পন্ন হল



প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সুশান্ত ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ অক্টোবর : দেশ এবং রাজ্যে গণতন্ত্রকে পদদলিত করছে বিজেপি ও তৃণমূল। গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব লাল বাগুর, মানুষকে সাথে নিয়েই গণতন্ত্রকে রক্ষা করবো আমরা। আদর্শ আমাদের রাজনীতির ভিত্তি তাই কেউ লালবাগুর উত্থানকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। ১৪ অক্টোবর মেমোরি নতুন বাসস্ত্যাঙে সি.আই.টি.ইউ পূর্ব বর্ধমান জেলা ১১তম সম্মেলনকে সামনে রেখে প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুশান্ত ঘোষ এ কথা বলেছেন। এদিন সমাবেশে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। জনশ্রোতের মাঝেই এদিন লাল বেলুনের সাথে সংগঠনের পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয় আকাশে।

বর্ণময় এই দৃশ্য নজর কেড়েছে মেমোরি মানুষের। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেহনতী মানুষের শ্রোত মেমোরি বাসস্ত্যাঙ উপচে সমাবেশ জয়গা করে নেয় রাস্তায়। ১৩ অক্টোবর মেমোরিতে তৃণমূল এমনই জনজাগরণের আভাস পেয়ে ফ্লেক্স, পতাকা ছিঁড়ে দেয় কিন্তু লাল বাগুর সমাবেশ তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এই সমাবেশে এছাড়াও এদিন বলেছেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুকান্ত কোণ্ডার, সভাপতি অঞ্জন চ্যাটার্জী। তিনি বলেছেন, এবার মানুষের তাড়া খাবে শাসকদলের নেতারা। জনগণ এই চোরের দলকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। দুর্নীতির দায়ে জেলে যেতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকেও।

তিনি বলেছেন, অনেক আক্রমণ, মিথ্যা মামলা, খুন, ধর্ষণের রাজ চালিয়েছে রাজ্যে শাসকদল এবার শ্রমিক, কৃষক খেতমজুর, কর্মচারী সহ সর্বস্তরের মানুষ জোট বেঁধে লড়াইয়ে এই অশুভশক্তিকে রাজ্যছাড়া করবে। এই লড়াইয়ে জিতবো আমরাই, এক ইঞ্চিও জমি আমরা ছাড়বো না। লড়াইয়ের মাটি বর্ধমান, সেই সংগ্রামে পথ দেখাবে এই জেলা।

মানুষের কাছে নেওয়া টাকাতে যে বাগা লাগিয়েছিলাম সেগুলো রাতের অন্ধকারে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে ওরা ভয় পেয়েছে, তাই পুলিশ ও দুষ্কৃতীরা আইন অমান্য মানুষের উপর পুলিশি অত্যাচার, —এরপর চোরের পাতায়

চোর ডাকাত তাড়িয়ে সাধারণ মানুষের পঞ্চায়েত গড়তে হবে—অঞ্জু কর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ই অক্টোবর : চোর ডাকাত, দাঙ্গাবাজদের তাড়িয়ে সাধারণ মানুষের পঞ্চায়েত গড়তে হবে। কালনার দুই শহিদের স্মরণার্থীনে বলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর। ১৯৭১ সালের ১৪ অক্টোবর প্রকাশ্য দিনের বেলায় কালনা-২ রুকের পূর্ব সাতগাছিয়া এলাকায় কংগ্রেসি ঘাতকবাহিনীর হাতে খুন হন কৃষক নেতা নিয়ামত আলী বারি এবং ছাত্রনেতা পিন্টু ব্যানার্জি। এই দুই শহিদকে স্মরণ করতে এদিন বাম কর্মী ও নেতারা পূর্ব সাতগাছিয়ার মদনগোপাল তলায় জমায়েত হয়ে নিয়ামত আলী বারির শহীদবেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। তার আগে পতাকা উত্তোলন করেন অঞ্জু কর। সেখান থেকে মিছিল



করে পিন্টু ব্যানার্জির শহিদবেদী স্থলে গিয়ে একই ভাবে তাঁকেও শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিন দুই শহীদকে স্মরণ করতে

গিয়ে অঞ্জু কর বলেন দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিনষ্টকারী, —এরপর চোরের পাতায়

‘নতুন চিঠি’ তার গ্রাহক,
পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও
শুভানুধ্যায়ীদের জন্য
শারদোৎসবের প্রীতি ও
শুভেচ্ছা এবং দীপাবলি ও
কালীপূজার আগাম
শুভেচ্ছা। ভালো থাকুন,
সুস্থ থাকুন।

রক্তদান বিষয়ক আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : একশো শতাংশ স্বেচ্ছা রক্তদাতা নির্ভর পরিষেবা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনর ফোরাম পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৬ অক্টোবর লায়ন্স ক্লাব অফ বর্ধমান এর অভিটোরিয়ামে এক শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা জেলার ৮৬টি রক্তদাতা সংগঠনের মোট ১২৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। শিবিরের উদ্বোধন করেছেন ডেপুটি সিএমওএইচ



ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনর ফোরাম এর ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি কবি ঘোষ, রিজিওনাল ব্লাড ট্রান্সফিউসান সেন্টার এর ডাইরেক্টর —এরপর চোরের পাতায়

বিকল্প হিসাবে রেশম চাষ পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৫ অক্টোবর : বিকল্প ফসল হিসাবে এবার পূর্বস্থলীতে শুরু হল রেশম চাষ। এই চাষ স্থানীয় বিডিও সরোজমিন দেখার পর উৎফুল্ল। তিনি এই চাষে উৎসাহ দিতে কৃষকদের যথাযথ সাহায্যও করতে চান বলে বলেও জানান। বাংলার ভাতঘর বলে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম কৃষি প্রধান মহকুমা কালনা। কৃষি লাভজনক করার লক্ষ্যে চিরাচরিত পাট, ধান, আলুর মতো ফসলের বিকল্প চাষের সন্ধান শুরু হয় বামফ্রন্টের আমলেই। এই

মহকুমায় বিকল্প ফসল হিসেবে বর্তমানে চাষ হচ্ছে বিভিন্ন সবজি, বাগিচা ফসল, ফুল ও ফলের নার্সারি প্রভৃতি। এই বিকল্প ফসলের চাষ করে শুধু কৃষকরাই লাভবান হয়নি, লাভবান হয়েছেন এলাকার শ্রমজীবী মানুষরাও।

তাদের কর্মসংস্থান হয়ে রুজি-রোজগারের পথ সুগম হয়েছে। পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত জাহাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জাহাননগর এলাকার কৃষক উমেশচন্দ্র দাস অন্যান্য ফসলের সঙ্গে তিনি রেশম



চাষ শুরু করেছেন। কয়েক বছর ধরে দেড় বিঘা জমিতে তুঁত চাষ করছেন। সেই তুঁত দিয়ে পলু পোকা পালন করে রেশমগুটি উৎপাদন করছেন।

এ থেকে তিনি বছরে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা লাভ করছেন বলে দাবি। খবর পেয়ে পূর্বস্থলী-১ বিডিও দেবব্রত জানা সরজমিন চাষ দেখতে যান। সবকিছু দেখার পর তিনি এই চাষ লাভজনক জেনে উৎফুল্ল হন। তিনি অন্যান্য কৃষকদেরও এই চাষে উৎসাহিত করতে সাহায্যের আশ্বাস দেন।

নতুন চিঠি

১৭ অক্টোবর, ২০২২

নিয়োগ দুর্নীতি ও শিক্ষার বে-হাল অবস্থা

শিক্ষা নিয়ে এ রাজ্যে যে ছেলেখেলা চলছে তার পরিণতি ভয়ঙ্কর। উপাচার্যের নিয়োগ বাতিল, উপাচার্যের হাজতবাস, প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতির গ্রেপ্তারি, ভুয়ো ডিগ্রির রমরমা, এসব হাজারো লজ্জাজনক ঘটনা তো আছেই। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ ও বদলি সংক্রান্ত যে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি সামনে এসেছে তাতে আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। আগে জানা গিয়েছিল মেধা তালিকার ওপরে যাদের স্থান তাদের উপকে অর্থের বিনিময়ে যারা তালিকার নিচে তাদের চাকরি দেওয়া হয়েছে। এখন জানা যাচ্ছে দুর্নীতির দাপট আরো বেশি। যারা কিছু লেখেনি, এমনকি পরীক্ষায় বসেনি, নিয়মের তোয়াক্কা না করে যা-খুশি নম্বর বসিয়ে তাদেরকে চাকরি বোচা হয়েছে। বেহায়া রাজ্য প্রশাসন যোগ্যতাসম্পন্ন যেসব চাকরি প্রার্থী প্রায় দু'বছর রাস্তায় বসে তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে, বে-আইনিভাবে যারা নিযুক্ত হয়েছে তাদের চাকরি বাঁচাতে উদ্যোগী হয়েছে।

এ উদ্যোগ মমতা বা দরদের যত চড়া রং থাকুক না কেন, সবাই জানে পাছে টাকা ফেরতের প্রশ্ন ওঠে তাই বে-কায়দায় পড়ে এখন মুখ্যমন্ত্রী মুখ বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু আইন ও নৈতিকতার থেকেও ভাবী প্রজন্মের বৌদ্ধিক বিকাশের প্রশ্নটি অনেক বড়। যে ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরে চাকরি হাতিয়ে শিক্ষকতা করছে তার হাতে আগামী প্রজন্মের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া আর খালসিকে ট্রাকের ড্রাইভারের আসনে বসিয়ে দেওয়া সমান আত্মঘাতী। যারা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে তারা শিক্ষাদান নয়, অর্থ উপার্জনকেই বড় করে দেখবে। মূল্যবোধের ধার দিয়েও তারা যাবে না—তাদের মুখে মূল্যবোধের কথা মানানসই হবে না। উৎকোচ দিয়ে চাকরি পাওয়ার ঘুরপথ তৈরি হলে জ্ঞানান্বেষণের উৎসাহে ভাটা পড়বে। এসবই ঠিক। কিন্তু এগুলো নৈতিকতার ব্যাপার। আসল কথা হল অযোগ্য শিক্ষকের কাছে ভুল শেখা লক্ষ লক্ষ বিদ্যার্থীর মানসিক বিকাশকেই কমজোরি করে দেবে, খর্ব করে দেবে।

কথাটা মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রী জানেন না এমন নয়। আসলে ক্ষমতার দস্তে বেপরোয়া হয়ে তাঁরা বাঘের পিঠে চেপে বসেছেন, এখন নামতে ভয় পাচ্ছেন। তা না হলে বীরভূমের বেতাজ বাদশাকে ‘বীরের’ সম্মান দিতে তার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত অপরাধীদের সুরক্ষা দিতে তৎপর হতো না প্রশাসন। কিন্তু মানুষ তো চূপ করে বসে থাকবে না। বাঘের পিঠ থেকে টেনে তাঁদের নামাবেই মানুষ। বিগত ১১ বছরে একটা প্রজন্ম প্রায় শেষ হতে বসেছে। ক্ষতি যাতে আর না বাড়ে তা মানুষকেই দেখতে হবে। আশার কথা, মানুষ জগছে—‘সততার প্রতীক’-কে কেউ আর বিশ্বাস করতে রাজি নয়।

জনমুখী পঞ্চায়েত গড়ার আহ্বান

নিজস্ব সংবাদতাতা, ১১ অক্টোবর : সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন গলসী-২ ব্লক কমিটির ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল খানাজংশনে। সম্মেলনের শুরুতে প্রতিনিধিরা খানাজংশন বাজারে মিছিল সংগঠিত করেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত বাউল নয়ন দাস। সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলা সম্পাদক গণেশ চৌধুরী। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন

সংগঠনের জেলা সহ সভাপতি, সাইদুল হক, জেলা সদস্য শ্যামচাঁদ মাজি ও কৃষক নেতা সাইফুল হক। উপস্থিত ছিলেন কাজী জাফর আলী। রুকের ৯টি অঞ্চল হতে প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি হাজির ছিলেন। সম্মেলন হতে ২৬ জনকে নিয়ে ব্লক কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক, সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ রূপে পুনঃনির্বাচিত হন বাসুদেব মাজি, সভাপতি অজয় শী ও শান্তিমান দাস।



বর্ধমানের নীলপুরে শারদীয়া পুস্তকের স্টল।

পূর্বস্থলীতে রাখি বন্ধন কর্মসূচি পালন

নিজস্ব সংবাদতাতা, পূর্বস্থলী, ১৬ অক্টোবর : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ও মানুষ মানুষে ভেদাভেদ দূর করতে পূর্বস্থলীতে রাখি বন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি ও বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশনের পূর্বস্থলী-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে বেলেরহাট হস্ট স্টেশনবাজারে রাখি পরানো ও পথসভা

অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন প্রদীপ কুমার সাহা, ফকরউদ্দিন মণ্ডল, বীরেশ্বর নন্দী, কার্তিক দাস প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন ক্ষিতীশ বিশ্বাস। বর্তমান সময়েও সাম্প্রদায়িক শক্তির উস্কানিতে যেভাবে সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে, তাতে এই কর্মসূচি আরো বেশি বেশি করে পালন করার সময় এসেছে এদিন।

স্বাস : সাই লালন ফকির

‘সব লোকে কয় লালন কী জাত
সংসারে,
লালন বলে জাতেক কি রূপ দেখলাম
না এ নজরে।’
অথবা
‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমন
আসে যায়।’

গানগুলি শুনলেই চোখের সামনে একটি কল্পিত মুখের ছবি ভেসে ওঠে। সে মুখ শান্তি, ধীর ও প্রতিবাদী। সে ছবি লালন ফকিরের। যিনি জাত, ধর্ম, সম্প্রদায় ও সমস্ত সংস্কারের বেড়া ভেঙে মানুষকে দিয়ে গেছেন প্রকৃত মানুষের মর্যাদা—তাঁর গানে, আচরণে ও তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

এক সময় হিন্দু কালচাঁদ হিন্দু ধর্মের কঠোর অনুশাসনের বলি হন এবং ‘কালাপাহাড়’ নাম নিয়ে হিন্দু ধর্মের ওপর চরম আঘাত হানেন। কিন্তু লালন হয়ে হিন্দুধর্মের ওপর কোনো আঘাত তো হানেনই নি, বরং মানুষের সমাজের অনুন্নত অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন আজীবন। তার জন্য শরিয়ৎপন্থী ইসলাম ও মৌলবাদীদের অত্যাচার ও নির্যাতন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে বারবার। ছোটবেলায় লালনের নাম ছিল ‘নালন’। প্রিয়জনেরা তাঁকে এই নামেই ডাকতেন। ‘নাল’ শব্দের অর্থ উর্বর জমি। উর্বরা মানবজমিতেই সূচনতা আবাদে তিনি ব্যস্ত ছিলেন শতাধিক বৎসরের আয়ুষ্কালে।

যতদূর জানা যায়, এখনো পর্যন্ত লালনকে নিয়ে দুটি উপন্যাস, চারটি নাটক ও একটি যাত্রাপালা রচিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত সব কটিতেই যেন তথ্য বিকৃতির প্রতিযোগিতা হয়েছে।

লালনের গৃহত্যাগ ও ধর্মান্তর নিয়ে নানা জনের নানা মত প্রচলিত আছে। যেমন—১. বিবাহের পর মা, স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে পুরী যাত্রা, ২. কাশী যাত্রা, ৩. নবদ্বীপ যাত্রা, ৪. কেন্দুয়ার মেলা ও বহরমপুর যাত্রা।

তীর্থযাত্রার পথে তিনি গুটি-বসন্তে আক্রান্ত হন। তখনকার দিনে গুটি-বসন্ত মানে নিশ্চিত মৃত্যু—এই ধারণা থেকে বন্ধু-বান্ধব এমনকি মা ও স্ত্রী পর্যন্ত পথিমধ্যে (মতান্তরে গঙ্গার চড়ায়) পরিত্যাগ করে পালিয়ে আসেন। লালন গবেষক শক্তিনাথ ঝা মায়ের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছেন ‘নির্দয়া জননী’ বলে। নিঃসন্তান সিরাজ সাই দম্পতি তাঁকে তুলে এনে সেবা গুস্তাষা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন।

সিরাজ সাই দম্পতির সেবায় নতুন জীবন ফিরে পেয়ে তিনি ফিরে যান নিজের বাড়িতে। বাড়িতে মাটিতে পা দিয়েই তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। স্ত্রীকে দেখেন বিধবার বেশে। মা নেন মুখ ফিরিয়ে। তাঁর আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সংসারের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। তাঁর একটি মাত্র অপরাধ, তিনি মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করেছেন। তিনি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সেই মুহূর্তে হয়তো তাঁর মনে পড়ছিল শৈশবের কত স্মৃতি। হয়তো মনে পড়ছিল মায়ের সেই ঘুমপাড়ানি গান, স্নেহচুষন। স্ত্রীর দিকে চেয়ে হয়তো মনে পড়ছিল বিয়ের রাতের মধুর স্মৃতি। হয়তো মনে পড়ছিল বিনীত রজনীর কথা। একটা দমকা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল তাঁর পাজির ভেদ করে। চোখ দুটো হয়েছিল ঝাপসা। অনেক অভিমান নিয়ে তিনি বাড়িতে এসেছিলেন। এসেছিলেন মায়ের কাছে, স্ত্রীর কাছে। বলতে এসেছিলেন—রোগ তো সব মানুষেরই হতে পারে, তাই বলে মা হয়ে, স্ত্রী হয়ে হৃদয়হীন মতো তাকে পরিত্যাগ করে চলে আসতে হবে! কিন্তু না, কোনো কথাই তাঁর বলা হয়নি। তিনি বুঝেছিলেন, একটি রোগ আর মুসলমানের অন্নগ্রহণ তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে সংসার থেকে। ছিন্ন হয়ে গেছে

অনিল মাইতি

সমস্ত সম্পর্ক, সমস্ত বন্ধন। শ্লথ পদে তিনি বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন বাড়ি থেকে। আসার সময় তাঁর নিজের হাতে বসানো শিউলি গাছটার একটা শাখা যেন প্রসারিত করে তাঁকে বাধা দিতে চেয়েছিল। লালন সেই শাখাটিকে জড়িয়ে ধরে ফেলেছিলেন দুফোঁটা চোখের জল। খাঁচায় পোষা টিয়া পাখিটা বার কয়েক ডেকেছিল তাঁর নাম ধরে। আলতোভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে শেষ বারের মতো তার দিকে তাকিয়ে বুকভরা অভিমান নিয়ে বেরিয়ে আসেন বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে। দেখেন, যারা ছিল আবাল্যের বন্ধু-বান্ধব, যারা হিন্দু, তারা অবস্থান করছে বহুদূরে। সকলের দিকে একবার দেখে নিয়ে সজল চোখে দুহাত দিয়ে পিতৃভূমিকে স্পর্শ করে জানালেন প্রণাম। তারপর চিরদিনের মতো বিদায় নিলেন মা স্ত্রী ও আত্মীয় পরিজন থেকে। জীবনে আর কোনোদিন তিনি ফিরে আসেননি বাড়িতে। অথচ যাত্রা-থিয়েটার ও সিনেমায় বহু কল্পকাহিনীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, যা লালন চরিত্রের পরিপন্থী। যাত্রাপালা দেখলে মনে হবে ‘নিমাই সন্ন্যাস’ দেখছি। পালাকার কোনো তথ্যেরই ধার ধারেননি লালন চরিত্রের। সে যেন তাঁর সৃষ্ট কল্পিত এক লালন ফকির।

মা, স্ত্রী ও সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হয়ে তিনি সোজা চলে যান সিরাজ সাইয়ের বাড়িতে। তারপর থেকে সিরাজ সাইয়ের বাড়িই হয় তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। সিরাজ সাইয়ের কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাই তাঁর গানে গুরু সিরাজ সাইয়ের নাম এসেছে বারে বারে। এখান থেকেই তিনি ‘লালন’ নামে পরিচিত হন।

‘নালন’ থেকে ‘লালন’ হওয়ার পিছনেও আরও একটি যুক্তিবোধ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ‘লালন’ মানে তো প্রতিপালন। সিরাজ সাই তো প্রতিপালনই করেছিলেন। তাই ‘লালন’ নামটি তাঁর গুরুপ্রদত্ত হওয়াটা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়।

লালন কোথায় জন্মেছিলেন এ নিয়ে বিতর্ক আছে। লালন গবেষক সুধীর চক্রবর্তীর অভিমত—“একটা হচ্ছে তাঁর জন্মসাল—আমরা কেউ জানি না। কোন গ্রামে, কোন অঞ্চলে? সমাজবিজ্ঞানের ধারা—আমরা তার সূত্রে দেখেছি, লালনের পিতৃপুরুষের কোন ভিটেমাটি নেই। অর্থাৎ লালনের কোন পূর্ব সূত্র নেই। যা আছে বানানো। কিছু একটা ভিত্তি খুবই সত্য, সেটা হচ্ছে যে, ছেউরিয়ায় তিনি আশ্রম গড়েছিলেন।” (রবীন্দ্রনাথ ও লালন ফকির, ‘নন্দন’, জুন, ২০০৫, পৃ. ৪৫)

সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়ের মতে, ‘...করিম সাহেবের অনুমান লালন ও সিরাজ কোনটিই প্রকৃত নাম নয়। দুটিই ছদ্মনাম। হতে পারে গুরুপ্রদত্ত নাম। তাহলে পিতৃপরিচয়টি অজ্ঞেয় থেকে যায়। পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত থাকলে কুল পরিচয়ও অজ্ঞেয়।’ করিম সাহেবের একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরও বলেছেন, ‘তবে সাধারণ প্রকাশ লালন জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্ঠিয়ার অধীন চাপড়ায় ভৌমিক বংশীয়ারা ইঁহার জাতি। ইঁহার কোন আত্মীয় জীবিত নেই।’ (‘হিতকরী’ পত্রিকা থেকে ‘লালন ফকির ও তাঁর গান’, অন্নদাশংকর রায়, পৃ. ২৮) চাপড়ার ভৌমিকরা যেহেতু তাঁর জাতি, তাহলে ওই অঞ্চলেই তাঁর জন্ম—এটা ভাবা বোধহয় ভুল হবে না।

লালন অসুস্থ হবার পর কি সিরাজ সাইয়ের সাথে তাঁর পরিচয়? এ প্রশ্নে শক্তিনাথ রায়ের বক্তব্য, ‘অসুস্থ হওয়ার অনেক আগেই হয়তো লালন গোপনে মতটি গ্রহণ করেছিলেন এককভাবে।’ (‘ফকির লালন সাই—দেশ, কাল ও শিল্প’, শক্তিনাথ ঝা, পৃ. ২১৯) যদিও এই মত

গ্রহণের রীতি যুগলে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে।

লালন কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? তাঁর গুরু সিরাজ সাই কি তাঁকে ধর্মান্তরিত হতে প্রভাবিত করেছিলেন? তার উত্তর পাই অন্নদাশংকর রায়ের কাছ থেকে। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত মণ্ডলানা রেজাউদ্দিনের লেখার যে উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন তা এইরূপ—“তিনি মোছলমানের অন্ন ভোজন ব্যতীত এছলাম গ্রহণ করেন নাই বা এছলামের আবিদা, বিশ্বাস ও নমাজ-রোজা প্রভৃতির কোন চিন্তাই কিন্মা আচার ব্যবহার কিছুই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল না, যদ্বারা তাঁহাকে মোছলমান বলা যাইতে পারে। তিনি মোছলমানের হোলিয়া অনুসারে মোছলমানের দরবেশ, ফকির হওয়া দূরে থাক, একজন মোছলমান বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারেন না। তিনি যতই মুনি, ঋষি উদাসীন হউন না কেন, মোছলমানের কেহই নহেন।’ (‘লালন ও তাঁর গান’, পৃ. ১৪)

লালন হিন্দু না মুসলমান—এ প্রশ্নের উত্তর তিনি তাঁর গানেই দিয়েছেন : “সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে। লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।” তিনি আরও বলেছেন, “সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন—লালন বলে আমার আমি না করি সন্ধান।”

লালন যে হিন্দু কায়স্থর ঘরে জন্মেছিলেন এটা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর পদবি নিয়ে বিশ্বাস্তি আছে। যেমন শক্তিনাথ ঝা ও অন্নদাশংকর রায়ের মতে ‘ভৌমিক’। কিন্তু সুধীর চক্রবর্তীর মতে ‘কর’।

লালন-গবেষকদের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায়, লালন ও সিরাজের বাড়ি কাছাকাছি ছিল। শক্তিনাথ ঝা-র মতে, সিরাজের সাথে লালনের ঘনিষ্ঠতা ছেলেবেলা থেকেই। এই যবন সঙ্গ মা ও স্ত্রী মেনে নিতে পারেননি। (এ, শক্তিনাথ ঝা, পৃ. ২১২)

“এই যবনসঙ্গ মেনে নিতে না পারার জন্যই সম্ভবত লালনের প্রথমা পত্নী সিরাজের কাছে যুগলে দীক্ষা নেননি। লালনের গৃহত্যাগের অনতিকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। নিঃসঙ্গ লালনের মা জাতিবুদ্ধি ত্যাগ না করায় এক বৈষ্ণব আখড়ায় যোগ দিয়ে দিনাতিপাত করেন। লালন দূর থেকে তাঁকে সাহায্য করেন।” (এ, শক্তিনাথ ঝা, পৃ. ২১২)

অপরদিকে ‘বাংলা ধাঁধার ভূমিকা’ গ্রন্থে জনৈক লুৎফর রহমান লালনকে অবিবাহিত ব্রহ্মচারী রূপে বর্ণনা করেছেন। এই লুৎফর রহমান সম্পর্কে শক্তিনাথ ঝা-র মন্তব্য—“এ ব্যক্তিই লালন বিষয়ে বহু কল্পকাহিনীর জনক।” (এ, পৃ. ২০৫) এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, লালনের মা, বাবা ও প্রথমা পত্নীর নাম কোনো গবেষকের গ্রন্থে জানা যায়নি। যাত্রা, থিয়েটার ও চলচ্চিত্রে যে নামগুলি জানা যায় তা সবই কল্পিত।

অন্নদাশংকর রায় ও শক্তিনাথ ঝা-এর মতে মৃত্যুকালে লালনের বয়স হয়েছিল ১১৬ বছর। অপরদিকে সুধীর চক্রবর্তীর মতে ১১৭ বছর। মৃত্যুর তারিখ ১৭ অক্টোবর ১৮৯০। (অন্নদাশংকর রায় ও শক্তিনাথ ঝা-এর মতে) কিন্তু ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র মতে, ১৭ অক্টোবর ১৮৮১। এ ব্যাপারে শক্তিনাথ ঝা-এর মন্তব্য, ‘উক্ত সালটি মুদ্রণ প্রমাদ হতে পারে।’ তবে বেশিরভাগ গবেষকই ১১৬ বছর বয়সটাই মেনে নিয়েছেন। তাহলে তাঁর জন্মসাল ১৭৭৪ সালকেই ধরতে হয়।

১৭৫৭ সালের ৩০ জুন পলাশীর আমবাগানে যুদ্ধের নামে প্রহসনে এবং মীরজাফর, জগৎ শেঠ, আমির চাঁদ ও ঘষেটি বেগমের বেইমানি ও বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীন নবাব

—এরপর তিনের পাঠায়

—*দুয়ের পাতার পর*

শ্রাস : সাই লালন ফকির

সিরাজদৌলার পতন ও ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়। ১৭৫৯ সাল থেকেই ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রাম সংগঠিত হয়। নেতৃত্বে নবাব মীরকাশিম। বাধে বঙ্গারের যুদ্ধ। যুদ্ধে মীরকাশিম বাহিনীর পরাজয় ঘটে। নবাব আশ্রয় নেন রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহী এলাকায়। তাঁর শেষ জীবন ওখানেই কাটে। ১৭৬৯-৭০ সালে ছিয়াত্তরের মঘন্তর। সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে একদিকে মজন্ শাহের নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলন বা ‘ফকির বিদ্রোহ’, অপরদিকে ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’ শুরু হয়। প্রায় একই সময়ে রাঢ়ভূম জুড়ে (অর্থাৎ বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও ধলভূম) সংগঠিত হয় ‘চুয়ার বিদ্রোহ’। এতে নেতৃত্ব দেন রাজার ভাইপো জগন্নাথ ধল। সবকটি সংগ্রাম স্থায়ী হয় প্রায় তিন দশক।

এই সময়ে বাংলার সমাজচিত্র কেমন ছিল তা দেখা দরকার। ‘ইংরেজ শাসন ও শোষণ এবং লুণ্ঠনে বাংলার হস্তশিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আর প্রাচীন বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল জেলা হস্তশিল্পীদের সঙ্গে, জেলে, মাঝি ও চাষীদের সঙ্গে।” (এ, শক্তিনাথ ঝা, পৃ. ২০৩) এই সামাজিক পটভূমিতে লালনের জন্ম ও বেড়ে ওঠা।

আগেই বলেছি, গৃহত্যাগের পর গুরুগৃহই হয় লালনের স্থায়ী ঠিকানা। এখানে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। স্ত্রীর নাম বিশাখা। কেউ বলেন লালমতি, আবার কেউবা মোতিবিবি (সূত্র : শক্তিনাথ ঝা)। তাঁর এই স্ত্রী দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন।

অনেকের মতে, বিশাখা ছিলেন মলম কারিগরের বোন। ওই মলম কারিগর ছিলেন লালনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরবর্তীতে শিষ্য। শিষ্যত্ব গ্রহণের পর মলম আখড়ার জন্য ভূমি দান করেন।

লালন তাঁর দীর্ঘ আয়ুষ্কালের মধ্যে কী সাধনায় ব্রতী ছিলেন? ফকির না বাউল? এ প্রশ্নের সমাধানে গবেষকরা একমত হতে পারেননি। সকলেই পৃথক পৃথক মত পোষণ করেছেন।

সুধীর চক্রবর্তীর মতে, “তাঁকে কেউ কোথাও বাউল বলেননি। সব সময় ফকির বলেছেন। লালনের গানেই আছে—‘আগে ফকিরি ছাড়, তবে হবে ফকির।’ ফকির কোনো আচরণ নয়, ফকির হচ্ছে একটা বিশ্বাস।... লালন বাউল ছিলেন না, লালন উদাসীন ছিলেন না। বৈরাগী ছিলেন না। জনবাদী ছিলেন।” (‘নন্দন’ জুন সংখ্যা ২০০৫, পৃ. ৪৮)

শক্তিনাথ ঝা-এর মতে, ‘বাংলাদেশের বহু গবেষক লালনপন্থীদের থেকে লালনকে পৃথক করে তাঁকে বাউল না বলে সুফী বলার পক্ষপাতী।’ কিন্তু বঙ্গের রক্ষণশীল সুফী পীর ঐতিহ্য লালনকে গ্রহণ করেনি। লালনপন্থীরা বা লালন নিজে সুফী হিসেবে আত্মপরিচয় দেননি।... শত্রু মিত্রের প্রদত্ত বিশ্লেষণ এবং আত্মপরিচয় সূত্রে বাউল শব্দের সঙ্গে এদের বিশেষ সম্পর্ক।’ (এ, পৃ. ২৪৪)

অন্নদাশংকর রায়ের বক্তব্য, “লালন শাহ ফকির মুসলমান ছিলেন না। নামটা হিন্দুর মত বলে কি হিন্দু ছিলেন? না, হিন্দু ছিলেন না। তিনি দুই সম্প্রদায়ের বাইরে তৃতীয় এক সম্প্রদায়ভুক্ত। যার নাম বাউল সম্প্রদায়।” (‘লালন ফকির ও তাঁর গান’, পৃ. ২৭)

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অভিমত, বাউল বলতে বোঝায় হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক ও গায়ক এবং ফকির বলতে বোঝায় মুসলমান সাধক ও গায়ক। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ক্ষিতিমোহন সেনের মতে, “হিন্দু-মুসলমান সমাজভুক্ত সাধক গায়ক পদকর্তাদের বাউল হিসেবেই বর্ণনা করেছেন।” (‘বাংলার বাউল’ দ্রষ্টব্য)

এবার আসি লালনের নিজের কথায়। “আরে ভাই না পাই দিশে/ কলির শেষে / কিসে কার মন মজেছে / ফকির চাঁদে রসিক চাঁদে সব মেতেছে / কোথা আর পাগল কানাই, লালন গোঁসাই/ সব ঠাই এতে হার মেনেছে।”

অনেক লালন অনুরাগী সাধক ও গায়ক লালনকে সহজিয়া ধর্মের উপাসক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি বেশ কয়েকটি লালন মেলায় উপস্থিত থেকে লালন অনুরাগীদের সাথে আলোচনা করে সহজিয়া ধর্মের সাথে লালনের সম্পর্কের যুক্তিগ্রহা করে ব্যাখ্যা পাইনি।

সুধীর চক্রবর্তীর মতে, “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে লালনের সাক্ষাৎ হয়নি। তবে লোকমুখে তাঁর গান শুনে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হন। তিনি লালনের ছেউরিয়া আশ্রম থেকে দুটি গানের খাতা কপি করিয়ে আনেন। খাতাদুটি আজও শান্তিনিকেতনে রক্ষিত আছে। তার থেকে ২০টি পদ তিনি ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ‘হারামনি’ বিশেষ ক্রোড়পত্রে প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, “‘রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বলেই লালন বিখ্যাত হন।” (এ, পৃ. ৪৭) সুধীর চক্রবর্তী আরও বলেন, কুষ্টিয়ার জেলা জজ মতিলাল দাস প্রথম লালনের গান সংগ্রহ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছেপেছিলেন। এটিই এ-দেশে লালনগীতির প্রথম সংকলন গ্রন্থ।

লালন ভগবান বা আল্লার পরিবর্তে মানুষকেই সর্বশক্তি নিয়ন্ত্রা রূপে বর্ণনা করে গেছেন শতাধিক বছর ধরে। সমাজের অবহেলিত, অনুন্নত, অস্পৃশ্য বলে কথিত মানুষরাই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন—সন্মান, অধিকার ও সামাজিক মর্যাদার জন্য। লালন আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন তাঁদের জন্য। তাঁর শিষ্য-শিষ্যার তালিকায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষরা ছিলেন, আজও আছেন। অর্থাৎ দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রীতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের তালিকা থেকেই বিষয়টি বোঝা যায়। তাঁর শিষ্যরা ছিলেন—বেলাহ শাহ, খোদবক্স, গোলাম ইয়াসিন শাহ, আব্দুল গনি শাহ, নিজাম শাহ, জামেলা খাতুন, ময়না

বেগম, মহেন্দ্র গোঁসাই প্রভৃতি।

তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের সংখ্যা নিয়েও গবেষকরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যেমন সুধীর চক্রবর্তীর মতে কুড়ি-বাইশ হাজার। অন্য গবেষকরা শুধু ‘হাজার হাজার’ বলে দায় সেরেছেন। তাঁর গানের সংখ্যা নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন দশ হাজার, কেউ সংখ্যাটা কমিয়েছেন, আবার কেউ দশ হাজার অতিক্রম করে গেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত যা জানা গেছে তাঁর ৩০০-র বেশি গান উদ্ধার করা যায়নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের একটি স্কেচের ছবি এঁকেছিলেন। হয়তো এই ছবি কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়ে থাকবে। এই ছবি নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তার উত্তর দিয়েছেন সুধীর চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন, “‘১৮৮৯ সালে (তাঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে—লেখক) একটি পোস্ট্রেট স্কেচ পাওয়া গেছে লালন ফকিরের। তাতে লেখা শিলাইদহ বোট ১৮৮৯। মূল ছবি রবীন্দ্রভারতীতে সংরক্ষিত আছে।” (এ, পৃ. ৪৬) যাঁরা এই ছবি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন, তাঁরা রবীন্দ্রভারতীতে ছবিটি দেখে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করলে ভালো হয় না কি?

লালন কোনোদিনই মন্দির ও মসজিদে যাননি। যাননি তাঁর শিষ্য-শিষ্যারাও। তিনি এবং তাঁর শিষ্য-শিষ্যারা কোনোদিন নমাজও পড়েননি, পুজোয় দেননি। তাই তো অন্নদাশংকর রায় বলেছেন, “লালনের গানে ঈশ্বর বা আল্লার নাম সাধারণত মলে না।” (এ, পৃ. ১)

লালন গান রচনা করতেন মুখে মুখে। সুর সৃষ্টি করতেন সেইভাবেই। বাদ্যযন্ত্র বলতে একটি একতারা। লিখে রাখার কোনো রীতি ছিল না। শিষ্য-শিষ্যারাও শুনে শুনে মনে রাখতেন এবং গাইতেন। তবে শিষ্য-শিষ্যারা সম্ভবত তা লিখে রাখতেন গোপনে। তিনি তাঁর নিজের কথা কাউকে বলতেন না। শিষ্য-শিষ্যাদের বলতে মানা ছিল।

তাঁর গুরু সিরাজকে বলা হয় ‘সাই’। যাঁরা দরবেশ তাঁদের নামের পাশে পদবি হয় শাহ। ফারসি ভাষায় এর অর্থ ‘মহারাজ’। লোকমুখে এদের পদবি সাই। ‘সাই’ শব্দের আরও একটি অর্থ হয়—ঈশ্বর। অর্থাৎ গুরুকে তাঁরা ঈশ্বর জ্ঞানে মানতেন। তাই তো তাঁর গানে ‘সাই’ শব্দটি এসেছে বার বার (দ্রষ্টব্য : অন্নদাশংকর রায়)

অন্নদাশংকরের মতে, “দরবেশরা সুফী। সুফী মানেই মুসলমান? তবে তারা কী? সুফীরা মুসলমান হলেও আনুষ্ঠানিক নয়। অনেক হিন্দু সুফী সাধক হলেও মুসলমান নয়। হিন্দু-মুসলমানের দুই বিভাগের ভিতর ও বাইরে লালনের মতো বাউল ও ফকিরের অবস্থান। এঁরা কোন পীরের মুরিদ নন, কিংবা কোন গোস্বামীর শিষ্য। এঁরা মসজিদেও যান না, নমাজও পড়েন না, পুজোও করেন না। শরিয়ৎ মানেন না, শাস্ত্রও মানেন না।” (এ, পৃ. ১, ২)

অন্নদাশংকর রায় আরও বলেছেন, “সব দরবেশরা বাউল নন। লালন দীক্ষার দিক থেকে দরবেশ, কিন্তু সাধনার দিক থেকে বাউল। বাউল সাধনায় দেহতত্ত্বের একটি আবশ্যিক স্থান আছে। যেমন আছে সহজিয়া, তান্ত্রিক, যোগী। এ সাধনায় নারী হচ্ছে অপরিহার্য সঙ্গিনী। নারীকে সমান ও স্বাধীন মর্যাদা দেওয়া হয়। ‘বাউল’ শব্দটি এসেছে ‘বাতুল’ থেকে। হিন্দিতে বাতুল থেকে বাউরা (বাউভুলে? —লেখক)। যেমন বৈজু বাউরা। এরা সমাজে থাকে না, গৃহী নয়, এদের সম্পত্তি থাকে না, সন্তান জন্মায় না।” (এ, পৃ. ১১)

আবার সুধীর চক্রবর্তীর মত আলাদা। তিনি বলেছেন, “‘বাউলরা বস্তুবাদী। ভাববাদী নয়। বস্তু মানে বীর্ষ। বাউলরা সেই বীর্ষ সংরক্ষণ করতে চায় এবং বাউলদের কোন সন্তান হয় না। শিষ্যরাই এদের সন্তান। বাউলদের যে পরম্পরা তা শিষ্য পরম্পরা। সন্তান পরম্পরা নয়।” (‘নন্দন’, ২০০৫, পৃ. ৪৯) শক্তিনাথ ঝায়ের বক্তব্য, “লালন বর্তমান প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। অনুমাননির্ভর প্রমাণে তাঁর অনাস্থা। তবে দৃষ্টান্ত দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।” (‘ফকির লালন সাই’, পৃ. ২১৫)

সুধীর চক্রবর্তী আরও বলেছেন, “লালনপন্থা আসলে একটা গৌণধর্ম। একটা সময় বৃহৎ বঙ্গে প্রচুর গৌণ ধর্ম ছিল। তবে অনেকগুলির আজ প্রায় অস্তিত্ব নেই। ‘বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়’ বইয়ে ১৩০টি গৌণধর্মের নাম পাওয়া গেছে।” (এ, পৃ. ৪৮)

একথা এখানে বলা জরুরি। বর্তমানে এই বাংলায় অধিকাংশ বাউল ও লালনপন্থীদের মধ্যে গঞ্জিকা সেবনের ব্যাধি আছে। এ প্রসঙ্গে লালন বলেছেন, “গাঁজায় দম দিয়ে মনা—বোম কালি আর বলিও না।”

আগেই বলা হয়েছে, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১১৬ বছর। তাঁর নির্দেশ মতো তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর ছেউরিয়ার আশ্রমের একটি ঘরের মধ্যে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে কোনো মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগেনি। শ্রাদ্ধাদিও হয়নি। হয়েছিল হরিনাম, কীর্তন ও শিষ্য-শিষ্যাদের মহোৎসব। (‘হিতকরী’ দ্রষ্টব্য)

বর্তমানে একদল মৌলবাদী মুসলমান তাঁকে ‘খাঁটি মুসলমান’ প্রমাণ করার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই তো তাঁর ছেউড়িয়া আশ্রম থেকে তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর সমাধির উপর খাঁটি মুসলমানের চাদর চাপিয়ে প্রতিদিন কোরান পাঠ করছে, যা লালন নীতির পরিপন্থী। (দ্রষ্টব্য : সুধীর চক্রবর্তী)

সাই লালন ফকিরকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। হচ্ছে নানান বিতর্ক। এ বিতর্ক ও গবেষণা ভবিষ্যতেও হবে। এরই মধ্যে বেরিয়ে আসবে অনেক অজানা তথ্য। তা ভবিষ্যৎ গবেষকদের সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস।

অন্য সংস্কৃতি

খড়কুটো

থারাবাহিক উপন্যাস কাকলি ঘোষ

—*গত সংখ্যার পর*

পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে আসে ঝরিয়া। নানা এলোমেলো চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসে। সব বন্ধ। সে তো কাজে যেতে পারবে না। তাহলে চলবে কী করে? বুধন ভিক্ষা করে বটে তবে ঝরিয়া বুধনের টাকা নেয় না। নিজের রোজগারেই চালিয়ে নেয়। বৌদির দেওয়া ক’টা টাকায় ক’দিন চলবে কে জানে? তারপর কী হবে? উপবাসের দিনগুলোর ছবি মনের কোণে ভেসে ওঠে। ঝরিয়া চোখ বন্ধ করে ভাবে কী করবে?

ঘরে ফিরে দেখে বুধন তখনও ফেরেনি। সকালে ভাত রান্না করে গেছিল। হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতেই আছে। বুধন খায়নি। এত রাত হয়ে গেল? কোথায় গেল লোকটা? মাথা গরম হয়ে যায় ঝরিয়ার, কত চিন্তা করবে? ঝরিয়া কলতলায় স্নান সেরে ঘরে ফিরে দেখে বুধন ফিরেছে। নেশা করেছে। ওকে দেখে ব্রহ্মতালু জ্বলে যায় ঝরিয়ার।

—সারাদিন কোথায় ছিলি?

—সে কৈফিয়তে তোর কী দরকার রে মাগি?

—কি বললি? আমারই খাচ্ছিস, আমারই পরছিস আর আমারই দাঁতের গোড়া ভাঙছিস।

—চোখ রাঙাচ্ছিস? মেয়েছেলের রোজগারের টাকায় আমি খাই না। তোকে তো টাকা দিই আমি।

—ভিখারির টাকায় আমি খাই না।

যা দিয়েছিস কুলঙ্গিতে রাখা আছে। যা নিয়ে আমার ঘর খালি কর। রোজ রোজ এত অশান্তি আমার আর ভালো লাগে না।

—আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিচ্ছি। যা বেরো মুখাপোড়া মিনসে।

বুধন দড়িতে ঝোলানো ওর জামাকাপড়, আর থালা বাটিটা পুঁচুলিতে বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। পথে নেমে ভাবে কোথায় যাবে? যেখানেই যাক খোঁড়া পা নিয়ে ও তো কোনো কাজ করতে পারবে না। ভিক্ষে করাই ওকে খেতে হবে। বুধন স্টেশনের রাস্তা ধরে। ভাবে ও গ্রামে ফিরে যাবে। গ্রামের হাটতলায় চালা বেঁধে থাকবে। যেতে যেতে দেখে, পাড়ার ওষুধের দোকানের সামনে, মুদির দোকানের সামনে লম্বা লাইন। কাল থেকে লক্‌ডাউন। সবাই দরকারি জিনিস কিনে রাখছে। বুধন পায়ে পায়ে পাশ কাটিয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়ায়। তার জীবনে আগামীকাল নেই। শুধু বর্তমান আছে। শুধু মুহূর্ত আছে। মুহূর্তটুকুরই বাঁচার লড়াই। হাতের আঁচলা থেকে জীবনটা কখন ঝরে যাবে ও জানে না। পায়ে পায়ে দোকানের সামনের লাইনটার পাশে কাটিয়ে ও চলে যায়। তার জীবনে আগামীর জন্য কোনো ভাবনা নেই।

চোদ্দ

সন্ধ্যা কলতলা থেকে বাসন মেজে ভিজে পায়ে ঘরে এসে ঢোকে। আজ থেকে লক্‌ডাউন। চারদিক কেমন থমথম করছে। কেউই কাজে যায়নি। সব ঘরেই লোক আছে। একটা করে ঘর। তিন তিন করে? বাইরের উঠানে সবাই জটলা করছে। সবারই কাজ বন্ধ। হাতে যা টাকা আছে তাতে হয়তো দু’দিন চলবে। তারপর? সেই চিন্তায় সবার মুখ থমথমে। সন্ধ্যাও ভাবতে পারে না কী করবে? ট্রেন বন্ধ। ঘরের এককোণে শিকৈয় ঝোলানো আছে টিপ, কানের দুলের ঝাঁপি। জানে না এগুলো নিয়ে

কোনদিন বেরোতে পারবে কি না? মুন্নি এখনও ঘুমোচ্ছে। ঘুম থেকে উঠেই খেতে চাইবে। যা আছে আজ-কাল চলে যাবে। তারপর? সন্ধ্যা আর ভাবতে পারে না। বাসনগুলো রেখে ঘরের চৌকাঠে বসে পড়ে। কতক্ষণ বসে ছিল জানে না।

—সন্ধ্যা। পারুলের ডাকে সন্ধিত ফিরে পায়।

—এভাবে চৌকাঠে বসে আছিস?

—কী করব দিদি? কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না। যা টাকা আছে তাতে দু’দিন হয়তো চলবে, তারপর?

—সেটাই তো মহা চিন্তা রে। কতদিন সব বন্ধ থাকবে কেউ জানে না। কী করে চলবে? আমিও কিছু ভাবতে পারছি না। মুন্নি উঠেছে?

—এবার মুমিকে ডাকব। উঠেই তো খেতে চাইবে। মুড়ি আছে দুটো তাই দেব।

—আমারও তো একই অবস্থা।

তবুও কিছু লাগলে বলিস। একটু বেলা মাসির খোঁজ নিয়ে আসি। পারুল চলে যায়। সন্ধ্যা চায়ের জল চাপিয়ে মুমিকে ডাকে।

লকডাউনের চারদিন হলো। সবার ঘরেই খাবার শেষ। যা জমানো টাকা ছিল সনাতন তাই দিয়ে সবজি কিনে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করতে বেরোচ্ছে। তাতে যা হচ্ছে কোনোরকমে চলছে। কাল কলেজের ছেলেরা এসেছিল। ওদের ঘর পিছু দু’কেজি করে চাল, আলু, ডাল, সাবান দিয়ে গেছে—ওরা রেড ভলান্টিয়ার। মাস্টারমশাইদের কমিউনিটি কিচেন বন্ধ করে দেওয়ার পর ছাত্ররা বলেছে ওদের বস্তির কাছে ‘কমিউনিটি কিচেন’ নাকি খুলবে। ওখানে একবেলা খাবার পাওয়া যাবে। তাতে কিছুটা আশ্বস্ত ওরা।

পারুল বিকেলে কলতলায় গা ধুয়ে ঘরে কাপড় ছাড়ছিল। বাইরে কে ডাকল—পারুল।

নন্দিতা দিদিমণির গলা না। তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে ও বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখে, নন্দিতা দিদিমণির সঙ্গে আরও দু’জন দিদিমণি আছে। তিনজনের হাতে বিস্কুট, বাচ্চাদের দুধ, সাবান, স্যানিটাইজার, মাস্ক ভর্তি তিনটে ব্যাগ।

নন্দিতা বলে—পারুল, চল বস্তির ঘরগুলো ঘুরি। এগুলো সবাইকে দিতে হবে।

পারুল ওদের সব ঘরে ঘরে নিয়ে যায়। নন্দিতা আর ওর বন্ধু সবাইকে বোঝায় সব সময় মাস্ক পরতে হবে। সবার সঙ্গে দূরত্ব রেখে কথা বলতে হবে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে বস্তির ছোট ছেলেমেয়েগুলো দল বেঁধে ঘুরতে থাকে। ওরা ঘুরতে ঘুরতে ক্লাবের কাছে চলে আসে। ক্লাবের ছেলেগুলো সব ক্যারাম পেটাচ্ছে। ওদের কাছে ছেলেগুলো বেরিয়ে আসে। কারোর মুখে মাস্ক নেই। নন্দিতা ওদের মাস্ক দেয়। বলে—এগুলো সব সময় পরে থাকবে।

—সে তো থাকবো বুঝলাম। আপনারা আমাদের বস্তিতে ঢুকেছেন কেন?

—আমরা সবাইকে স্বাস্থ্য সচেতন করতে চাই। আর দরকারি কিছু জিনিস বিলি করতে এসেছি। নন্দিতা বলে।

—আমাদের এখানে ওইসব স্বাস্থ্যসচেতনতা-টচেতনতা দেখাতে আসবেন না। আমরা আছি আমরাই সব। কালকে কলেজের ছেলেরা এসেছিল কমিউনিটি কিচেন না কি খুলবে। সব শালাকে তাড়াব এখান থেকে। আমাদের বস্তি আমরাই দেখব।

—তোরা কী করেছিস? ক্লাবে ঢুকে দিনরাত ক্যারাম খেলছিস। আর কী করেছিস তোরাই জানিস। পারুল বলে।

—কাকি ভবে কথা বলবে। আমাদের সঙ্গে লাগতে এসো না। ছেলেগুলো বলে। (চলবে)

ধানে বাদামি শোষক পোকার আক্রমণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ অক্টোবর : কালনা মহকুমার কালনা-১ ব্লকে বাদামি শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। এই আক্রমণ ঠেকাতে না পারলে ফসলের উৎপাদন অনেকটাই কমে যাবে বলে মত কৃষি বিশেষজ্ঞদের। কালনার সিমলন গ্রাম পঞ্চায়েতের সারগড়িয়া গ্রামের কৃষক সুভাষ সরকারের জমিতে জায়গায় জায়গায় গাছ ধান হলুদ হয়ে গিয়ে বসে যাচ্ছে। এর প্রতিকার তিনি জানতে চান। এই ব্যাপারে কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তরের সহ আধিকারিক ডক্টর পার্থ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন, বাদামি শোষক হল একটি সুপরিচিত ধানের পোকা। বপনের পর্যায়ে বাদামি শোষক পোকার নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় হল, কীট নজরে এলেই বীজবপন করা জমিতে জল ভরে দেওয়া। কিন্তু বাদামি শোষক পোকার সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে কীটনাশক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এই পোকা দমনের মোক্ষম কীটনাশক হচ্ছে হ্যাসিফেট নামক কীটনাশক। কিন্তু এই ঔষধ ব্যবহারের আগে ধান গাছের ৮ সারি অন্তর অন্তর ধান গাছ হেলিয়ে দিয়ে গোড়ায় আলো ও হাওয়া বাতাস আসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তাতে বাদামি শোষক পোকা দমন হয়ে যেতে পারে।



দীর্ঘ ১২ বছর পর খুলল সন্ত্রাসকবলিত বোঁয়াই-এর সিপিআই(এম) অফিস

সিপিআই(এম) নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৭ অক্টোবর : সিপিআই(এম)-এর মেমারি ১ নম্বর পূর্ব এরিয়া কমিটির পূর্ণ গ্রাম এলাকার সিপিআই(এম) সেখ আব্দুর রহমান (৫৬) প্রয়াত হয়েছেন। দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের পর বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। দেবীপুর সমবায় ইউনিয়ন কো-অপারেটিভের ম্যানেজার ছিলেন। সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য সকল মানুষের কাছে প্রিয় ছিলেন। এদিন বেলা ১১টা নাগাদ মরদেহ নিয়ে একটি শোকমিছিল তার বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। তাঁর মরদেহ লাল পতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পার্টি নেতা জগন্নাথ গাঙ্গুলি, সেখ মনিরুদ্দিন, আস্তাজ আলি দফাদার, অভিজিত



কোঙার, সনৎ ব্যানার্জী, অসিত রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

শ্রমিক সংগঠনের নেত্রীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ অক্টোবর : সিআইটিইউ-এর কালনা-২ সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্যা লক্ষ্মী মূর্মুর (৪৯) জীবনাবসান হয়েছে। চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হলে মৃতদেহ বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আটকেটিয়া গ্রামের বাড়িতে আনা হয়। সেখানে লাল পতাকা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) তথা গণসংগঠনের নেতাকর্মীরা। শ্রদ্ধা জানান বিমল ব্যানার্জী, মুক্ত মূর্মু, রীতা দুবে, সুভাষ বেসরা, ভারতী মালিক, বাপ্পা কিস্কু, সোম মূর্মু, বিশ্বনাথ কিস্কু, শিবু মূর্মু প্রমুখ। প্রয়াত লক্ষ্মী মূর্মু স্থানীয় বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুইবারের সিপিআই(এম)-এর প্রতীকে নির্বাচিত সদস্যা ছিলেন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন মিড ডে মিল কর্মী। সিআইটিইউ-এর কালনা-২ সমন্বয়



কমিটির অন্যতম সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। স্থানীয় আটকেটিয়া শাশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে তাঁর স্বামী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে বর্তমান।

প্রান্তজন—আত্মজন (৭৩)

রত্না রশীদ

পুজো আসে, পুজো যায়। ক্যালেন্ডারে আঁকা আছে, সাদামাটা মানুষজনের প্রাণে গাঁথা আছে, একেইয়ে প্রাত্যহিক খোড়-বড়ি-খাড়ার আলুনি জীবনে খানিক কমিক (!) লিরিফ, হয়তো বা কারো কারো পুরোটা জীবনের ট্রাজিক বিলিফ। বহুকৌণিক প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত হয় ‘পুজার’।

এর লৌকিক দিক নিয়ে বলার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে বিপুল অর্থনৈতিক লেনদেন, সাংস্কৃতিক দেওয়া নেওয়া, মানুষে মানুষে আবেগের সংলগ্নতা। একটা পুজো মনে বহু বছরের বিপুলতার সম্ভার। অন্তত এখন যেমন দেখছি। দিনে দিনে লক্ষ্য ভেসে যাচ্ছে উপলক্ষ্যের বাহ্যে। তাতে আমার দুঃখ পাবার কিছু নেই। খুব কিছু ঈশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ ভক্তজন নই আমি। বাবার বংশের কালীঘাট আর মায়ের বংশের সোনামুখীর মার্কামারা বংশানুক্রমিক সেবায়তি খুব ভেতর থেকে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়ে বুকেছি এ্যাতো ভালো নির্বিঘ্ন রোজগারের উপায় আর নেই। বাপ নয়, তবে আগের চোদ্দপুরুষ এই করে পায়ের ওপর পা তুলে অট্টালিকা

বসবাসী হয়ে জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়েছে। ওরা বলবে না কেন আকাশের দিকে আঙুল নির্দেশ করে, জীব দিয়েছেন যিনি, আহা! দেবেন তিনি। ওই আকাশে রাজত্ব করে যে দেব-দেবী, তারাই তো ওদের লগ্নি করা মূলধন। আকাশ বলে তো আদপে কিছু নেইই, তার ওপর আবার অদৃশ্য দেবদেবী। ভয় করো, নইলে মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়বে। জানা চেনা চিনি, যা ছুঁয়ে দেখা সম্ভব, তাতে অতো রহস্য ভীতি থাকবে না। অতএব অদৃশ্য বস্তুর ভয় দেখাও। ভূতের মতো ভয় পাবে ভগবানকে। কী ধুরন্ধর বুদ্ধি রে বাবা! এমন প্যাঁচ কষে গেলো যে, গৃহস্থের মাচার প্রথম লাই কুমড়ো শশাটা, গরুর খাঁটি দুধের ভর্তি কেঁড়েটা, মানসিকের হার দুলা আংটি টায়রা মানতাসা খাঁড়া মায় সাপ পর্যন্ত সোন-রূপোয় গড়িয়ে এনে দেয় দেব-দেবীর পায়ের। ঠাকুর খেতে পারে না, অগতায় সেবাইতরা খায়। ঠাকুর বেনারসি পরে বসে আছে। জমে যাওয়া শাড়ি, গয়না, বেনারসি পরে সেবাইতের কন্যাদের বিয়ে হয়। বৌয়েরা মায়ের শাড়ি বারোমাস পরে। গামছা জন্মে কিনতে হয় না, উল্টে একে তাকে বিতরণ করা চলে। নতুন ওঠা চাল, কলা মূলো ঠাকুরকে না দিয়ে কেউ খাবে

না। এলাকার লোকজন তো বটেই, দুরাগত ভক্তবৃন্দের দলও। সবাই জানে দেবদেবী খেতে পারে না, তবু দেয়। দিয়েই চলেছে আবহমান কাল ধরে। যতো যজমান, ততো স্বাচ্ছন্দ্য। রাজা জমিদাররাও চাইতো জনগণ হাবা-গোবা ভয়ে ভীত হয়ে থাক। মাথায় হাত বুলাতে সুবিধে হবে। এই ভয় ভক্তি টিকিয়ে রাখার জন্য মন্দির প্রতি দেবোত্তর সম্পত্তি লিখে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করে গেছে। খাজনা লাগবে না, শুধু ভোগ করো। ধামা-ধামা ফল-পাকুড় মণ্ডা-মিষ্টির ছড়াছড়ি। দোকানে চলে যায় বিক্রি হতে। কে অতো খাবে! একদম ভেতর থেকে সব দেখেছি নিজের চোখে। কি করে পুজো নামের বুজরুকিতে বিশ্বাস করতে পারবো! কিছু হয় না পুজো না করলে। ঠাকুরের থানে বোকা ভক্তরা পয়সা ছুঁড়ে দিতো, একটু পিছন ফিরেছে, কি তুলে নিয়ে ছুট। চপ সিঙ্গারা মিষ্টি খেতাম দলে বেঁধে। কিছু হয়নি। ঠাকুর পাপ দেয়নি আমাদের। আমরা ভোগ দিলে তবে খেতে পায় (সত্যি খেলে চালাক সেবাইতরা অন্ততঃ দিতো না) ক্ষমতা হবে আমাদের ক্ষতি করার! রীতিমতো পোষা ঠাকুর আমাদের। আমরা যা বলবো তাই শুনবে।

(চলবে)

সাধারণ মানুষের পঞ্চায়েত গড়তে হবে

—প্রথম পাতার পর

দুর্নীতিবাজ বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। বিজেপি ফ্যাসিস্ট কায়দায় দেশ পরিচালনা করায় আক্রান্ত দেশের দলিত-সংখ্যালঘুরা। অন্যদিকে তৃণমূলের স্বৈরাচার ও দুর্নীতিতে জেরবার রাজ্যের সাধারণ মানুষ। এর হাত থেকে মুক্তি পেতে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে চোর ডাকাতিদের হাত থেকে পঞ্চায়েত ছিনিয়ে নিয়ে সাধারণ মানুষের পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে হবে। শুধু তৃণমূলের বিরুদ্ধেই নয়, সাম্প্রদায়িক বিজেপির বিরুদ্ধেও তীব্র আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার শপথ নিতে হবে। অঞ্জু কর ছাড়াও স্মৃতিচারণা করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা স্বপন ব্যানার্জী। সভা পরিচালনা করেন মহম্মদ শাহ।

বিজ্ঞান মঞ্চার স্টল

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১৫ অক্টোবর : শারদোৎসব উপলক্ষে বর্ধমান শহর বিজ্ঞান কেন্দ্র ও দুর্গাপুর বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে দুটি বুক স্টল হয়। বর্ধমানের স্টলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ডাঃ তুষার বটব্যাল ও ডাঃ গীষ্মতি চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ড. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। দুর্গাপুরের বুকস্টলের সামনে বিজ্ঞানকর্মীরা অসংখ্য মানুষের কাছে ডেপু রোগ প্রতিরোধে প্রচারপত্র পৌঁছে দেন।

জেলা সম্মেলন সম্পন্ন হল



নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক

নবনির্বাচিত সভাপতি

—প্রথম পাতার পর

গুণ্ডামীর ছবিগুলো বেছে বেছে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন শাসকদল পুলিশ নিয়ে গুণ্ডামি করছে, পুলিশ সরে গেলেই এক মাসের মধ্যে শাসকদলের দুষ্কৃতীদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে তাদের চেয়ে মানুষের ক্ষমতা অনেক বেশি।

এদিনের সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আভাস রায়চৌধুরী, প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার, কৃষক নেতা সৈয়দ হোসেন সহ অন্যান্য প্রবীণ ও নবীন নেতৃবৃন্দ। ১৫ ও ১৬ অক্টোবর দুদিন মেমারিতে ১১তম প্রতিনিধি সম্মেলনে জেলার ৩০টি ট্রেড

ইউনিয়ন থেকে ৩২৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

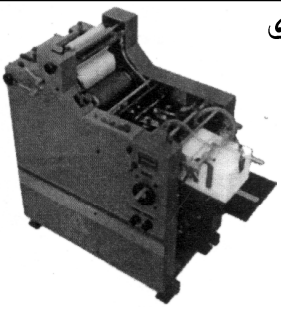
সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহ ১১তম প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধন করে বলেন গ্রামে শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুরদের একা গড়ে তুলে কর্পোরেট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-এ জোট গড়তে হবে। টানা দুদিন প্রতিবেদনের উপর আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন সুকান্ত কোঙার। এখান থেকে আগামী দিনে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি শক্তিশালী ৯৭ জনের জেলা কমিটি নির্বাচন হয়। যার সভাপতি ও সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হোন যথাক্রমে নজরুল ইসলাম, তাপস চ্যাটার্জী ও মহবুব আলম।

রক্তদান বিষয়ক আলোচনাসভা

—প্রথম পাতার পর

ডাঃ সোমা ঘোষ দত্ত, রশ্মি ব্রাদ সেন্টার-এর সম্পাদক ড. সম্বরণ প্রামাণিক, থ্যালাসেমিয়া বিশেষজ্ঞ ডাঃ তপন ঘোষ, ডাঃ সঞ্জিত চ্যাটার্জী সহ আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আলোচক আসানসোল জেলা হাসপাতাল ব্রাদ সেন্টারের ইনচার্জ ডাঃ সঞ্জিত চ্যাটার্জী ও কবি ঘোষ প্রমুখ।

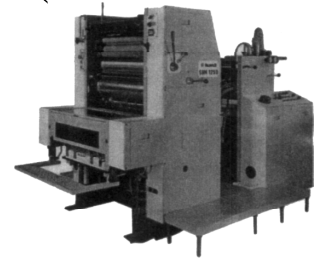
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ



সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com



ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ বা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ বা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান ইহতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা